রাধিকা

রামচন্দ্র প্রামাণিক

দামোদর তৈরি হয়ে নিল। কিন্তু মনের মধ্যে খচ খচ করছে। রাধিটার সঙ্গে দেখা হল না।

রাধি অবশ্য গত ক-দিন কথা বলছে না তার সঙ্গে। কিচেনের এদিকটায় এসেছে কম। যখন দামোদর ঢুকেছে বাথরুমে বা টয়লেটে কিংবা নীচে গিয়েছে কোনো কাজে, সেই ফাঁকে বাসনগুলো মেজে ফেলেছে টুক করে। না হলে দিনভোর লেগে রয়েছে অন্য কাজে— জামাকাপড় কাচা-গোছানো-ইস্ত্রি করা। ডাস্টিং আর ঘর মোছা। গড়ের মাঠের মতো বিশাল ফ্ল্যাট। মোছা কি চাট্টিখানি কথা? তার ওপর আছে ম্যাডামের খবরদারি আর দিদিমণির ফাইফরমাশ। রাধির হাত তাই খালি থাকে না কক্ষনো।

প্রথম যেদিন দেখেছিল এই ফ্ল্যাটটা— সেন্ট্রালি এয়ার কন্ডিসন্ড, আলিপুরে উডল্যান্ডস্ নার্সিং হোমের সামনে, টিপটপ সাজানো বাগান দিয়ে ঘেরা— তখন বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে সে এখানে কাজ করবে। আর কাজই-বা কী এমন! রান্নাটা কি আর কাজের মধ্যে পড়ে? এমন ভালো ভালো জোগাড় থাকলে শুধু খাওয়া নয়, আনন্দের হয় রান্না করাটাও।

কাল কষা মাটন বানিয়েছিল। তার সিংহভাগ রয়ে গেছে ফ্রিজে। ছোলার ডাল আর ফুলকপি-মটরশুঁটির ডালনাও রয়েছে অনেকটা। ম্যাডাম বললেন, ওসব আমি গরম করে নেব মাইক্রোওভেনে। ভাতটা শুধু করে রেখে দাও। আর সকালের ব্রেকফার্স্ট। সাহেব ওয়াক থেকে ফিরুন, বাচ্চারা ঘুম থেকে উঠুক। আমিই গুছিয়ে দেব তখন।

আজ রবিবার, এ বাড়ির সব কিছু শুরু হওয়ার কথা দেরিতে। নেহাৎই দামোদর চলে যাবে বলে ম্যাডাম উঠলেন এত তাড়াতাড়ি। না হলে অন্য ছুটির দিনে এ সময়ে মধ্যরাত।

দামোদর ভাবছিল, রাধিকা এল না। ওকে আজ মাংস খাওয়াবে ভেবেছিল। কপালে নেই ওর তো সে কী করবে? ছুটির দিনে কখনো-সখনো দেরি করে আসে। তাই কাল যখন বাসন মাজছিল স্রিঙ্কে, তখন দেওয়ালকে শুনিয়ে দামোদর স্বগতোক্তি করেছিল। আমার ট্রেন কাল সকাল এগারোটা পঁচিশে। কাপুর সাহেবের ড্রাইভার বলছিল রাস্তায় খুব জ্যাম হচ্ছে আজকাল। তাই অনেকটা সময় হাতে নিয়ে বেরুতে হবে। ট্রেন ফেল করার থেকে হাওড়া স্টেশনে বসে রেস্ট নেওয়া অনেক ভালো।

রাধি কোনো রা কাড়েনি। তার দিকে তাকায়নি পর্যন্ত। থমথমে মুখে বাসনগুলো মেজে টাওয়েল দিয়ে মুছে জায়গামতো রেখে বেরিয়ে গেল কিচেন থেকে। ঘরে যেন দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। কাউকে যেন দেখতেই পেল না চোখে।

তার বদলি একজন রান্নার লোক ঠিক হয়েছে। কিন্তু সে আসবে কালকে। এসব ম্যাডামের বুদ্ধি— দামোদর বুঝতে পারে। আগের লোকের সঙ্গে নতুন লোকটির কথাবার্তা হোক— এটা তেনার ইচ্ছে নয়।

প্রথম প্রথম যতটা কড়া মনে হত, ঠিক ততটা কিন্তু নয় ম্যাডাম। কাজে লাগানোর সময় কত শর্ত! এটা করবে, ওটা করবে না ইত্যাদি। কিন্তু পরে দেখল নিজেই তিনি ঢিলেঢালা। মনে রাখতে পারেন না ঠিক কী হুকুম দিয়েছেন। জিনিসপত্র নিয়ে এত কড়াকড়ি! অথচ কোমরে ব্যথা, নিচু হয়ে ফ্রিজ খুলে দেখতে পারেন না কতটা খাওয়া হল আর কতটা বাঁচল। কতদিন রয়ে গেল ফ্রিজে তাও জানেন না। দিদিমণি আর এক কাঠি ওপরে। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। শুধু মাঝে মাঝে হুংকার দেন— ফ্রিজে যা কিছু রয়েছে সব সাফ করো। ফেলে দাও শিগ্‌গির।

দামোদর তাই রাধিকে খাওয়ায় পেট ভরে। ম্যাডামের সঙ্গে কথা হয়েছিল— প্রতিদিন সকালে পাবে দুটো রুটি আর একটু সবজি। সঙ্গে এক কাপ চা। ব্যাস্। প্রথম ক-দিন তাই দিয়েছিল দামোদর। কিন্তু সে তো জানে ফ্রিজে মাছ আছে পরশু দিনের, মাংস গত সপ্তাহের, পনিরের ডালনা আরও আগের, এবং কোনো এক সকালে দিদিমণি অর্ডার দেবে— সাফ করো ফ্রিজ। আজকেই। তাহলে?

রাধি ভয় পেত। খেতে বসে প্লেটের দিকে তাকিয়ে বলত, ও চক্কোত্তি দাদা, কেন দিচ্ছ এতসব? জানতে পারলে ম্যাডাম কিন্তু রেগে যাবে। দামোদরের দেখাদেখি সেও ডাকত ম্যাডাম, আর মেয়েটিকে দিদিমণি।

দামোদর বলত, আমরা সবাই এতসব খাই আর তুই চিবুবি শুধু শুকনো রুটি? তাও যদি নষ্ট না হত এসব! ফেলে-ছড়িয়ে বরবাদ করার চেয়ে মানুষের ভোগে লাগলে ভালো নয়?

একদিন পার্টি ছিল ফ্ল্যাটে। অনেক রাত অব্দি চলেছিল গল্পগুজব খানাপিনা। পরের দিন রবিবার। রাধি যখন এল তখনও পুরো বাড়ি ঘুমে কাদা। দামোদর বলল, হাত ধুয়ে খেয়ে নে আগে! দিল রাতের বিরিয়ানি আর মাংস মাইক্রোওয়েভে গরম করে। দিল চিকেন কাবাব এবং আইসক্রিমও। এত সুখাদ্য রাধি বোধহয় খায়নি কোনোদিন। কিচেনের মেঝেয় বসে খাওয়া সেরে রাধি বলেছিল, তুমি না দাদা খুব ধার্মিক মানুষ।

কী রকম? দামোদর জিজ্ঞেস করে।

রাধি বলল, আমাদের ওখানে মোসলমানদের ধর্মসভা হয়। মাইকে বক্তৃতা দেয়। তা একদিন বলছিল, কোরান শরিফে লেখা আছে— আল্লাতলা বলছেন, নিজে খেতে বসার

আগে দেখে নেবে পড়শিরা সবাই খেয়েছে কিনা। তুমি তো আজ ভাত-রুটি না-খেয়ে, এগুলো নিজেই খেতে পারতে, তা না করে আমায় দিলে। তাই বলছি— তুমি একজন দিলদার সাচ্চা আদমি।

দামোদর বলল, দূর বোকা। মোসলমান পাড়ায় থেকে থেকে তোরও ওইরকম বুদ্ধি হয়েছে।

রাধি থাকে সন্তোষপুরের ওদিকে। সেখান থেকে ট্রেনে এসে মাঝেরহাট স্টেশনে নামে। তারপর পায়ে হেঁটে আলিপুর। একদিন জিজ্ঞেস করেছিল— এত দূরে এত কষ্ট করে কেন আসিস তুই? ওখানে কোনো বাড়িতে লেগে গেলেই তো পারিস।

তা রাধি বলে, না গো দাদা, ওখানে রেট বড্ড কম। এখানে যা পাই, ওখানে চার-পাঁচ বাড়িতে খাটলেও সে টাকা উঠবে না। না হলে কেউ এতদূরে আসে ওইটুকু বাচ্চা ফেলে?

দামোদর জিজ্ঞেস করে, কত বড়ো হল তোর ছেলে?

তা রাধি বলে, একবছরও হয়নি। সেই কোন সকালে দুধ খাইয়ে বেরুই। আর বেলা গড়িয়ে গেলে ফিরে গিয়ে তবে আবার খাওয়াই। মাঝখানটায় সামলায় মা। খিদে পেলে কাঁদলে মুখে বোতল ধরে।

রাধিকে প্রথম যেদিন দেখল, মনে হল জলে ভেজা কলমিলতা। নধর ডগার মতো রোগারোগা হাত দু-খানায় ফট ফট করছে শাঁখা, কচি পাতার মতো শ্যামলা কপালে পাকা বটফলের মতো টক টক করছে সিঁদুর। ঢুকত ভয়ে ভয়ে, চোখ তুলে তাকাতে পারত না ভালো করে। যেন বাঘ-সিংহভরা জঙ্গলে ঢুকেছে হরিণ-শিশু। ম্যাডামের দাপুটে চেহারা আর গমগম করা গলা শুনে সে যেন আর নিজের মধ্যে থাকত না।

ক-দিন পরে রাধি বাসন মাজছে। দামোদর দেখল সে আঁচলে বেড় দিয়ে পিঠ ঢেকেছে। কাজ করতে করতে আঁচল খসে পড়ছে, আর সে ভিজে হাতে সেটা ফের তুলে দিচ্ছে পিঠের ওপর। লক্ষ করল পিঠে একটা লম্বা কালো কাটা দাগ, কাঁধের কাছে ঢুকে গেছে ব্লাউজের নীচে। এইসব ছোটোলোকদের ঘরে পুরুষগুলো প্রায়ই হয় নেশাখোর, বোল বলতে হাত তোলে বউয়ের গায়ে। দামোদর বুঝল, মেয়েটাকে পিটিয়েছে ওর স্বামী। দুপুর যখন গড়িয়ে যাচ্ছে, রাধির সঙ্গিনী মেয়েটি যখন বাইরে করিডরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে লিফ্টের কাছে, তখন দামোদর একটা অর্ধব্যবহৃত মলমের টিউব রাধির হাতে দিয়ে বলেছিল, এটা কাটা-পোড়ায় খুব কাজ দেয়। তোমার সঙ্গের মেয়েটিকে দিয়ে এই মলম পিঠের ঘায়ে লাগিয়ে নাও এক্ষুনি। দিনে তিনবার লাগাবে। সেরে যাবে শিগ্‌গির।

হ্যাঁ, তখনো রাধিকে 'তুমি' বলত দামোদর। 'তুই' বলা শুরু করল তো অনেক পরে।

ম্যাডাম বললেন, ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছে ওখানকার মোবাইল নম্বর জানাতে ভুলবে না। নতুন লোকটা কেমন হবে কে জানে! গুরপ্রীত খুব উপকারটা করল আমার।

গুরপ্রীত সাহেবের অফিসের এক অফিসার। ব্যাঙ্গালোরে পোস্টেড। তাকে দামোদর বলেছিল, একটা চাকরি যদি হয় ওখানে। সাহেবের সামনেই বলেছিল। সাহেব হেসে

বলেছিলেন, হ্যাঁ, গুরপ্রীত পারলে ভালোই। পুরুষ মানুষ, বিয়ে-থা করেছে। কত দিন আর হাতা-খুন্তি নাড়বে পরের কিচেনে?

হ্যাঁ, বিয়েও করেছিল দামোদর। কিন্তু সে বউ নিয়ে ঘর করার কপাল হয়নি তেমন। মেয়েটি ছেলেবেলা থেকে মৃগী রোগী। লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছিল তার বাপ। বলা নেই কওয়া নেই, সময় অসময় নেই— আঁ-আঁ করে চোখ উলটে পড়বে দাঁত কপাটি লেগে। রয়েছে তার বাপের বাড়িতে। দামোদর কিছু টাকা পাঠায় মাসে মাসে।

তা ব্যাঙ্গলোরের চাকরি জোগাড় হয়েছে সেই গুরপ্রীত সাহেবের দৌলতে। কিন্তু অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়। ওখানেও সেই রান্নার কাজ। ছাদের ওপর অ্যাসবেস্টসের চাল তুলে শোওয়ার ঘর, স্নানের এবং রান্নার ঘরও। সেখানে দামোদরের থাকার ব্যবস্থা। ফেমিলি নিয়েও থাকতে পারে। মাইনে? এখানে যা পায় তার প্রায় তিনগুণ।

মেমসাহেবের মাথা গরম। গুরুপ্রীতের চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করে গালিগালাজ করলেন। তা সাহেব বললেন, অত ভাবছ কেন? অফিস থেকেই আর একজনকে ব্যবস্থা করে দেবে।

ক-দিন এল না রাধি। মধ্যে ম্যাডামের বোনঝি-জামাই এল, দিদিমণির বন্ধু এল। রাজ্যের ডাঁই বাসন মাজতে হল দামোদরকে একা। এত বড়ো ফ্ল্যাট মোছা-পরিষ্কার করা বড়ো সহজ কাজ নয়। সে তখন খাবি খাচ্ছে আর মনে মনে তড়পাচ্ছে রাধির ওপর। তখন পুরো হপ্তাটা পার করে তবে উদয় হলেন তিনি। মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে।

কী সংবাদ?

অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে যা জানল দামোদর তা এই :

রাধির বর হঠাৎ একদিন এসে হাজির তার মায়ের বাড়িতে। অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে বলল, অনেক টাকা হারামজাদি কামাই করছে ওই গতর ভাঙিয়ে। অর্ধেক ভাগ তার চাই। এই নিয়ে হুজ্জোতি। মেরে কপাল ফাটিয়ে দিয়েছে একেবারে।

পরের দিন সেই দুই দিদিমণি এসেছে যারা বস্তিতে বাচ্চাদের পড়ায়, বাচ্চার মায়েদের রোজগারের ধান্দা করে দেয়, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। তারাই রাধিকে ধরে থানায় নিয়ে গিয়ে ডাইরি করিয়েছে বরের নামে। বরকে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে কেস দিয়েছে। তিনদিন হাজত খেটে জামিনে ছাড়া পেয়ে সে আবার এসে চড়াও হয়েছে রাধির ওপরে। এবার আর মারধোর করতে সাহস পায়নি। তবে লোক জড়ো করে চিল্লিয়ে তাকে ত্যাগপত্র দিয়েছে। বলেছে, যে থুতু সে ফেলে দিল একবার, আর তো তুলবে না মুখে।

এসব বলতে বলতে আর একবার কাঁদল রাধি। তারপর চোখ মুছতে মুছতে গিয়ে ঢুকল কিচেনে, শুরু করল বাসন মাজা। দামোদর ভাবছিল, বর অন্য মেয়েলোক নিয়ে থাকে, লোকজন সাক্ষী রেখে হইচই করে তাকে ছেড়ে দিয়েছে, তবু মেয়েটা কপালের সিঁদুর মোছেনি, হাতের শাঁখাও খোলেনি। ধন্য মেয়েমানুষের মন!

একদিন কী একটা ব্যাপার নিয়ে কিছু কথাবার্তা চলছিল নীচে। এ বাড়িতে চিৎকার চেঁচামেচি হয় না। এত চাকর-বাকর, বাগানের এতগুলো মালি, হাউসিং-এর অফিসের স্টাফ— তবু তেমন শব্দ নেই। দামোদর তাই দুপুরের কাজকর্ম সেরে নীচে গেল ব্যাপারখানা বুঝতে।

শুনল— পাশের ব্লকের দুটি কাজের মেয়েকে নিয়েই ঝামেলা। শাঁখা-সিঁদুরে তারা নিপাট হিন্দু বউ। চতুর্বেদী সাহেবের বাড়িতে পুজোর সব কাজ— ফুল-বেলপাতা গোছানো থেকে চন্দন বাটা পর্যন্ত সব করে তাদের ঠিকে মেয়েটি যে ওদেরই একজন। ওই বাড়িতে এক রঙের মিস্ত্রি এসেছিল। জানিয়েছে যে, মেয়েদুটি তার চেনা, আকড়ায় থাকে, মুসলমান। তাই নিয়ে হুজ্জোতি।

দামোদর তো অবাক। জিজ্ঞেস করল, স্বীকার গেল তারা?

নীচের লোকটি বলল, প্রথমে কি যায়? তখন মিসেস চতুর্বেদী চেপে ধরলেন : বাপের নাম বল, স্বামীর নাম বল। তা দিব্যি বলে দিল হিন্দু নাম। ফাঁপরে পড়ল যখন ওদের গোত্র জিজ্ঞেস করলেন। তা তো বলতে পারে না। দায়ে পড়ে তখন সত্যিটা স্বীকার গেল। বলল, আলিপুরের এদিকটায় কাজের রেট খুব হাই। কিন্তু মুসলমান মেয়ে তো রাখবে না। তাই শাঁখা-সিঁদুর পরে হিন্দু সেজে কাজে আসে। আবার ফেরার পথে স্টেশনে গিয়ে সব বদলে ফেলে।

পরের ক-দিন নীচে ওই একটাই আলোচনা। অ্যাকাউন্টস্-এর নিকুঞ্জবাবু বললেন, অতসব খোঁড়াখুঁড়ি করা কিছু কাজের কথা নয়। বাঁচার জন্য মানুষ কী না করে! গায়ে পইতে ঝুলিয়ে যত লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তুমি কি ভাবো তারা সবাই নৈকষ্য ব্রাহ্মণ? আর্যরা তো ছিল গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহী উন্নতনাসা। ব্রাহ্মণ তো তাদের মধ্য থেকেই হওয়ার কথা। তাহলে? দামোদরের দিকে তাকিয়ে বললেন, জিজ্ঞেস করো এই চক্কোত্তিকে। কত ব্রাহ্মণের গায়ের রং কালো— ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। তা হল কী করে? নিশ্চয়ই কেউ একজন দু-নম্বরি করে ব্রাহ্মণ সেজেছিল। সে নিজে না করলে তার বাপ কিংবা ঠাকুরদা করেছে। না হলে তস্য তস্য আরও তস্য পূর্বপুরুষদের কেউ। কালো রঙটাতো আর আকাশ থেকে পড়েনি।

দামোদর ভাবছিল, রাগ করার কিছু নেই। তার নিজের গায়ের রং তো ফর্সাই বলা যায়। তাই তাকে খোঁচা দিয়ে কিছু বলার উদ্দেশ্য নিশ্চয় ছিল না নিকুঞ্জবাবুর। কিন্তু তার ভগ্নিপতি কুচকুচে কালো এবং বেঁটেও। তালুই মশায় এবং মাউইমাকেও কৃষ্ণবর্ণই বলতে হবে। তবু তো তাঁরা ব্রাহ্মণ। ছেলে পিওনের চাকরি করে ব্যাঙ্কে। বাঁধা চাকরি। তাই সুরূপা বোনটিকে তার হাতে দিতে পেরে তারা বর্তে গেছে। দামোদরের নিজের দাদুও কালো। দিদিমা ফর্সা বলে তাঁর রঙটা পেয়েছে তাদের মা। তাহলে কোথায় কোনখানে কবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঢুকে পড়ল শূদ্রের কিংবা অনার্যের রক্ত তা কে বলতে পারে? কিন্তু ঢুকেছে যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ওই যে মেয়েদুটি আকড়া না কোথা থেকে আসে, কোনো অনিষ্ট তো করেনি কারও। যার হাত থেকে ফুল-বেলপাতা-চন্দনকাঠ কেনো তার কি জাত জান? মেয়েদুটি দিনে কয়েক ঘণ্টা শুধু বেশ বদলে কাজ করেছে। গতর খাটিয়ে কাজই তো করেছে। তা কত কাজের জায়গায়ই তো তাদের নিজস্ব ড্রেস রয়েছে। পুলিশ-মিলিটারি-নার্স-ট্রেনের চেকার— ডিউটি করার জন্য এদের সবাইকে কি আলাদা পোশাক পরতে হয় না? শাঁখা-সিঁদুর ছিল মেয়ে দুটির কর্মক্ষেত্রের সাজ। যস্মিন দেশে যদাচার। তাহলে? দোষ দেবে কী করে?

রাধির সঙ্গে কথা বলে বুঝল সেও জানে পাশের ব্লকের ব্যাপারটা। মেয়েদুটিকে অবশ্য সে চেনে না। দামোদর হাসতে হাসতে বলল, তোর গোত্র জিজ্ঞেস করতে পারে ম্যাডাম। বলতে পারবি তো? সে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ। কাশ্যপ।

দামোদর বলেছিল তোর ছেলেটার ছবি দেখা একদিন। রাধি বলে, ফটে তুলতে পয়সা লাগে না? দুধ কিনে দিতে পারি নে তো ফটো! দামোদর বলে, ওরে, পয়সা দিয়ে ছবি তুলতে কে বলেছে তোকে? মোবাইলে তুলে আনবি। দামোদর বলে, আমারটা নিয়ে যা। এটাতে তুলে আনতে পারবিনে?

রাধি তখন বলল, রক্ষে করো। আমার হারামি লোকটা জানতে পারলে এসে ঠিক কেড়ে নিয়ে যাবে। তখন তোমার ফোন আর ছেলের ফটো দুইই যাবে।

রাধির বরের কথা দামোদর জানতে পেরেছে আস্তে আস্তে। পেটে বাচ্চা আসতেই কপালে আগুন লাগল মেয়েটার। পেট সাইজে যত বাড়ে, আগুনেও তত বাতাস লাগে। এল্লতটার মেজাজ যখন দাউ দাউ করে জ্বলছে তখন একদিন তার মনে হল এই জবুথবু বউটাকে নিয়ে আর চলবে না। ডবকা একটা বিধবাকে ধরল তখন। রাধির সঙ্গে তার সম্পর্ক এখন শুধু লাথি-ঝাঁটার। আমাকে দেখতে পেলি সে আর মানুষ থাকে না— রাধি বলে।

প্রথম দিকে মেয়েটা খুব ভয়ে ভয়ে থাকত। বোধহয় ভয়ানক সব গল্প শুনেছে কাজের বাড়ির সম্বন্ধে। অতবড়ো ফ্ল্যাট, একদিকে থাকলে বোঝাই যায় না অন্যদিকে কী ঘটছে। কিচেনে তাই বাসন মাজতে ঢুকত এমনভাবে যেন বাঘের খাঁচায় ঢুকছে। যখন শুনল দামোদর বিবাহিত, বউ রয়েছে গাঁয়ে, তখন যেন ধাতস্ত হল একটু। তারপর দেখল সাহেব মানুষটিও বাঘ-ভালুক নয়, ছেলেটি নেহাতই নাবালক, স্কুলে পড়ে, তখন বাকি ভয়টুকুও বোধহয় কাটল। মেমসাহেব অবিশ্যি খান্ডারনি আর তেনার ধিঙ্গি মেয়েটি মেজাজি। কিন্তু মেয়েমানুষকে তত ভয় পায় না অন্য মেয়েমানুষ।

রাধির হাতে ধবধবে শাঁখা দেখে হাসি পায় দামোদরের। একদিন বলেছিল, হ্যাঁরে, সেই বদমাশটা তো তোকে ত্যাগ করেছে। তাহলে তার দেখতাই এসব পরিস কেন এখনও?

মলিন মুখে রাধি বলেছিল, সে তুমি বুঝবে না।

এরমধ্যে দামোদরকে ছুটতে হল শ্বশুরবাড়ি। খবর এসেছিল মোবাইলে। ফিরলে জানা গেল তার বউ পুকুরে নেমেছিল স্নান করতে। কেউ বোধহয় খেয়াল করেনি। সেখানেই তার ব্যামো চাগিয়েছে। জল থেকে যখন টেনে তুলল সবাই মিলে, তখন সে মরা কাঠ। ম্যাডাম বললেন, দুঃখ কোরো না। চিরকালের মৃগী রোগী। সে তোমায় মুক্তি দিয়ে গেছে।

দামোদর বলেছিল, বাড়িতে কুকুর-বেড়াল থাকলেও মায়া পড়ে যায়, ম্যাডাম।

রাধি ছিল গম্ভীর হয়ে। কোনো কথা বলেনি। না কোনো দুঃখের কথা, না সান্ত্বনার। দামোদর ভাবছিল, বউয়ের প্রসঙ্গে কুকুর-বেড়ালের উপমা টানাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। বড়ো নরম মন ওই মেয়েটার।

ব্যাঙ্গালোরের পাকা খবর এলে সে সাহেবকে সব বলল। ম্যাডাম চটে গেলেও সাহেব সামলে দিলেন। বললেন, পুরুষ মানুষের জন্য সারাজীবন কারও বাড়িতে রান্নার কাজ কোনো কাজের কথা নয়। ওখানে অনেক অপরচুনিটি। চেষ্টা কোরো অন্য কিছু জুটিয়ে নিতে। তোমার তো ডিগ্রি নেই এ লাইনে। ভালো হোটেলে রান্না করার যোগ্যতা তোমার আছে। কিন্তু শুধু পইতে দেখিয়ে কিছু পাওয়া মুশকিল যদি না ডিগ্রি থাকে একখানা।

রাধি তো জানে সে চলে যাচ্ছে। আজকেই। অথচ এল না একবারের জন্যও। চোখের দেখাটাও হল না শেষবারের মতো। আচ্ছা, কী এমন খারাপ কথা সে বলেছিল যে এত রেগে গেল? স্বামী তো তোকে ছেড়েই দিয়েছে। তবু এত গুমোর!

গত সোমবারে সে বলেছিল, হাসতে হাসতেই বলেছিল, আমি তো চলে যাচ্ছি রোববারে। হয়তো আর দেখা হবে না কক্ষনো।

বড়ো বড়ো দু-চোখ মেলে বিষণ্ণ মুখে রাধি তাকিয়ে ছিল তার দিকে।

দামোদর বলল, রাধিরে, আমার তো আর কোনো পিছুটান নেই। ওখানে ফেমিলি নিয়ে থাকার কোয়ার্টার দেবে। যাবি আমার সঙ্গে?

রাধির মুখটা ঝক করে কালো হয়ে গেল। তারপরেই চোখদুটো জ্বলে উঠল ধক করে। আগুন ঝরানো গলায় বলল, ছি! তুমি না বামুনের ছেলে!

মাংস তুলে রেখেছিল আলাদা করে মাইক্রোওয়েভপ্রুফ কাচের বাটিতে, ফুলকপির ডালনা অন্য একটায়। রাধির জন্য। সেগুলো বের করল ফ্রিজ থেকে, গুছিয়ে নিল ছোটো ছোটো প্লাস্টিকের ডাব্বায়— যেগুলোতে হোটেল থেকে খাবার দেয় প্যাক করে। আটটা পরোটা বানিয়ে নিল, তার দুপুর আর রাতের জন্য ট্রেনের খাবার হয়ে যাবে এতে। কার জন্য সজিয়ে রাখা আর কার ভোগে লাগে! দামোদর ভাবে। নীচে গেল ইয়ারবন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। কারও সঙ্গে গলা মেলানো, কারও শুধু হাত ধরা। সাহেব-মেমসাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিল প্রণাম করে। এমন যে জাঁদরেল ম্যাডাম, তিনিও কিন্তু নরম হয়ে গেছেন অনেকটা। ছোটো সাহেব হাত তুলে বলল, বাঁয়ে। কিন্তু দিদিমণির ঘরের দরজা বন্ধ। হয় ঘুমোচ্ছে নয়তো বসে আছে মোবাইলে কিংবা ল্যাপটপে মুখ গুঁজে। তাকে

কেউ ঘাঁটায় না, বাবা-মাও সমঝে চলে। দামোদর ভাবছিল, রাধি তো দিদিমণির বয়সিই হবে। অথচ কত ফারাক দুজনের জীবনে! আরও কত দুর্গতি আর দুর্ভোগ লেখা আছে ওই অভাগির অদৃষ্টে তা কে বলতে পারে! লিফ্‌টে নীচে নামতে নামতে ভাবছিল দামোদর— এই এক বাড়িতেই কতটা বদলে গেল তার জীবন!

স্টেশনে পৌঁছে দামোদর দেখল নয় নম্বর প্লাটফর্মের ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাধি। কোলে ছেলে, পায়ের কাছে বসিয়ে রাখা একটা ব্যাগ। শাঁখা-সিঁদুরে চেনা মানুষটা সেজেগুজে ঝলমল করছে। দামোদরকে দেখে ঝোঁকি মেরে বলল, বাব্বা! এতক্ষণে সময় হল তোমার?

দামোদর হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিল। এক গাল হেসে বলল, অনেকক্ষণ এসেছিস? যেন সে জানত রাধি দাঁড়িয়ে থাকবে, কথাবার্তা যেন বলাই ছিল।

রাধি রাগতস্বরে বলল, সেই নটা থেকে। এক টিটিকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাঙ্গালোরের ট্রেন কোথা থেকে যাবে? তা সে ট্রেনের নাম জিজ্ঞেস করল। সে কি তুমি বলেছ? শেষে যখন বললাম এগারোটা পঁচিশে ছাড়বে, তখন এই প্ল্যাটফর্ম দেখিয়ে দিল। রাধি কাঁদো কাঁদো হয়, যেন সব দোষ দামোদরের।

দামোদর ছেলেটাকে আদর করতে করতে বলল, খোকার তো টিকিট লাগবে না। তুই এই জিনিসগুলো আগলা। নজর রাখিস খেয়াল করে। আমি তোর টিকিটটা কেটে আনি।

গমনোদ্যত দামোদরের জামা খপ করে ধরে ফেলল রাধি। বলল, একটা কথা বলা হয়নি তোমাকে।

দামোদর অবাক হয়। কী কথা?

রাধি চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর ফিসফিস করে বলল, পাশের ব্লকের কথা মনে আছে? আকড়ার সেই মেয়ে দুটো? নাম ভাঁড়িয়ে কাজ করত সাততলায় আর তিনতলায়?

দামোদর হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বলল, তাতে কী?

রাধি আবার মুখ নামাল। ডানপায়ের বুড়ো আঙুলটা ঘষল প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে— যেন নরম মাটি খুঁড়ে ফেলবে এক্ষুনি। তারপর মরিয়া হয়ে বলে ফেলল, আমিও ওদের মতো। রাধিকা নয়, আমার আসল না রাবেয়া। সবাই ডাকে 'রাবি' বলে।

দামোদর হতভম্ব হয়ে বলল, আর তোর বর?

রাধি বলল, সেই যে বলেছিলাম— পুলিশে ডাইরি করলাম বলে সে আমাকে তালাক দিয়েছে।

দামোদর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, তবে তো মিটে গেছে। তাহলে আর চিন্তা কিসের?

রাধি বলে, না। চিন্তা আর কী? তবে সব কথা তোমাকে না বললে আমার পাপ হবে না?

দামোদর বলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। সব বুঝেছি আমি। এবার বল দেখি— সেদিন অমন মুখঝামটা দিলি, আজ তাহলে এলি কেন?

রাধি চুপ করে রইল মাথা নিচু করে।

দামোদর তবুও চুপ করে আছে। একবার চোখ তুলে তাকিয়ে আবার নামিয়ে নিল মুখখানা।

দামোদর বলল, লক্ষ্মী সোনা, সত্যি কথাটা বল আমাকে। কখন ঠিক করলি যে আসবি?

দু-বার ঢোক গিলে রাধি বলল, কাল রাতে। মনে হল, ও না থাকলে কী করে ঢুকব ওই বাড়িতে?

সত্যি বলছিস?

সত্যি। রাধি বলল, আল্লার কিরে।